Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.08-23
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ডালু ও তাঁদের সমাজ-সংস্কৃতির পরিচিতি

মানচিত্র পাল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, অসম

Abstract:

Dalu are one of the small ethnic groups of Northeast India. There are different opinions about their origin. According to many researchers, they are part of the Garos and Hajongs. And according to many, they are a part of Manipuris. But Dalus are not willing to accept this argument. According to them, they are a distinct ethnic group. Because, they have their own language, culture and tradition etc. In this article an attempt has been made to present various information about the society and culture of Dalus.

Keyword: Dalu, Garo, Hajong, Monipuri, Folklore, Folk rhymes, Folkriddle, Folksong, Folkbelief.

ডালু কারা? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ডালুরা হল সহজ-সরল, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল ও শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা এক ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী। যাঁরা ইন্দো-মঙ্গোলয়েড এবং বোড়ো জাতি-গোষ্ঠীর একটি শাখা। এবং বৈষ্ণবধর্মে বিশ্বাসী ও হিন্দু ঐতিহ্যের বহনকারী। জানা যায়, ডালুরা ক্ষত্রিয়। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন, গোনারদি নামে জনৈক কাশ্মিরী ক্ষত্রিয়ের বংশধর বলে। তাঁরা বিশ্বাস করেন দলন বা দল্লব নামে তাঁদের এক রাজার নাম থেকেই ডালু নামের উৎপত্তি। ডালুরা নিজেদেরকে মহাভারতের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলে মনে করেন।[১] প্রসঙ্গক্রমে, ডালুদের সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষকদের অভিমতগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রিয়ার্সন সাহেব লিখেছেন :

"Dalu is a dialect of Garo spoken in Garo Hills but not a subgroup of Garo tribal community… it also designates the name of a tribal sect which used to speak Hajong Bengali in the foot hill areas of the Garo Hills and in Mymensingh (Bangladesh) and Sylhet (Bangladesh) of undivided India."[২]

হান্টার সাহেবের মতে:

"The Mandai, Koch, Dalu, Hadi-Hotri, and Mech Tribes, all bear strong points of resemblance."[৩]

ড. ইব্রাহিম আলি মণ্ডল (Dr. Ebrahim Ali Mondal) লিখেছেন:

"Dalu's is the name of an unpopular and backward small ethnic group… There are no well established historical and reliable recorded accounts on their origin…"[৪]

T. B. subba 'Ethnicity VS Development: The Dalus in The West Garo Hills District of Meghalaya' প্রবন্ধে লিখেছেন:

"The Dalus are a small and very backward community… They have only two graduates till now and majority of them are illiterates or semi-literates earning their bred mainly by selling their manual labour…"[৫]

খগেন্দ্র হাজং সাপ্তাহিক 'একতা' পত্রিকায় বলেছেন:

"বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলে ডালুরা সংখ্যালঘু জাতিদের মধ্যে অন্যতম। … তবে বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন (২০১০)-এ-২৩ নং তফশিলের ১৪ নম্বরে রেখেছেন ডালু সম্প্রদায়কে। …"[৬]

উইকিপিডিয়াতে জানা যায়:

"ডালুরা হচ্ছে বাংলাদেশে বসবাসকারী একটি ক্ষুদ্র জাতি। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট এবং শেরপুরের নালিতাবাড়ি অঞ্চলে ডালুদের বাস। তাদের আসল ভাষা মণিপুরি।"[৭]

খগেস কিরণ 'ময়মনসিংহ জনসমাজ' প্রবন্ধ ডালুদের সম্পর্কে জানান:

"ডালুরা গারো সম্প্রদায়ের রোগা কৌমভুক্ত, গারোদের মতই এদের মাচং ছিল এবং ডালুরা গোনারদি নামক কাশ্মিরী ক্ষত্রিয়ের বংশধর। পশ্চিম ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের দ্বারা বিতাড়িত জনৈক দল্লক বা দলক নামক রাজা ডালুতে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা থেকে ডালু শব্দের উৎপত্তি…।"[৮]

ডালুদের জাতিগত স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী লোকেদের মাঝে সমস্যা দেখা দেয়। সেই সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন রাজমোহন ডালু। এ বিষয়ে তিনি বলেছিলেন:

"গারো আদিবাসীরা দাবি করেছিল ডালু আদিবাসীরা এসেছে গারো জাতিসত্ত্বা থেকে। আবার হাজং আদিবাসীরা দাবি করেছিল ডালুদেরর উৎপত্তি হাজংদের থেকে। অর্থাৎ ডালুদের জাতির স্বকীয় উৎপত্তিগত পরিচয় নিয়ে আদিবাসীদের মধ্যেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। সংকটপূর্ণ অবস্থায় উদ্যোগ নিয়ে ডালুদেরকে একত্র করে ১৯৯৩ সালে জাতীয় আদিবাসী দিবসে "আমরা ডালু আদিবাসী বাংলাদেশকে ভালোবাসী" এই শিরোনামের ব্যানার মিছিল নিয়ে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যাই। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ছিল, ডালুদের পরিচয় নিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে যে দ্বিধার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিবাদ করা এবং আদিবাসী হিসেবে ডালুদের স্বতন্ত্র পরিচয় জনসমুখে তুলে ধরা। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে ময়মনসিংহে আদিবাসীদের মিটিং-এ এই বিষয়ে আলোচনা করি এবং প্রতিবাদের মাধ্যমে ডালুদের অধিকারের কথা তুলে ধরি। এই আলোচনায় আদিবাসী লেখক সুভাষ জেংচাম আমার মতামতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এরপর ডালুদের স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে এরপর কোন সংশয় সৃষ্টি হয়নি।"[৯]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে জানা যাচ্ছে, ডালুরা হচ্ছে পিছিয়ে পড়া এক জনগোষ্ঠী; এঁদের আদি ভাষা ভাষা ছিল মণিপুরি। তাঁরা অধিকাংশই নিরক্ষর। তাঁদের উদ্ভবের নির্ভরযোগ্য সেরকম তথ্যও পাওয়া যায়না। তবে তাঁরা অবিভক্ত ভারতের গারো হিলস, মৈমনসিংহ ও সিলেট প্রভৃতি স্থানে বসবাস করেন। এঁদের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় হাজং, গারো, মেচ ও কোচ প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর লোকেদের।

ডালুদের লোকসংখ্যা: ড. ইব্রাহাম আলি মণ্ডল-এর মতে জানা যায়, ডালুদের লোকসংখ্যা ৩৫,০০০। এর মধ্যে ২৩,০০০ মেঘালয়ে এবং ১২,০০০ অসমে বসবাস করেন।[১০] এক্ষেত্রে 'বাংলাদেশের ডালু' গ্রন্থে দেখা যায় বাংলাদেশে ডালুদের সংখ্যা ডালু গবেষক জেংচাম-এর মতে, দেড় হাজার এবং আরেক ডালু

গবেষক আইয়োব-এর মতে, এক হাজার। এ প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে : "বাংলাদেশে ডালু জাতিগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা সম্পর্কে ১৯৯৭ সালে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এক আদমশুমারি তথ্যের বরাত দিয়ে জেংচাম উল্লেখ করেন যে, বর্তমানে বাংলাদেশে ডালু জনসংখ্যা দেড় হাজার (২০০৭ : ৯)। এক্ষেত্রে আইয়োব তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার গারো পাহাড়ের তলদেশে ... ডালু সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার লোক বসবাস করে (২০০৭ : ১১৫)। ..."[১১] তবে, খগেন্দ্র হাজং-এর মতে, ডালুদের সংখ্যা ময়মনসিংহে ৫০০ বেশি নয়। 'একতা' পত্রিকায় জানা যায়, গত শতাব্দীর শুরুতে ময়মনসিংহ জেলায় ডালুদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে তা কমে দাঁড়ায় ৫০০-র কম।[১২]

ডালুদের বাসস্থান: ডালুদের আদি বাসভূমি মণিপুর। মণিপুর থেকে তাঁরা পরবর্তীকালে জীবন-জীবিকা বাঁচাবার জন্যে এসে আশ্রয় নেন গারো পাহাড়ে। পাহাড়ে আশ্রয় নেবার পর তাঁরা নানান সমস্যার সম্মুখীন হন। এক কৃষিকাজে অনুপযুক্ত পাহাড়। সঙ্গে জলেরও অভাব। ফলে তাঁরা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে জীবনযাপন করবার জন্যে সেখান থেকে চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভোগাই নদীরপাড়ে এসে আশ্রয় নিয়ে একটা লিক্কা বা দুর্গ বানিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেন। কিল্লাটির নাম হয় ডালুকিল্লাপাড়া। তবে, যে সব ডালুরা কিল্লাপাড়া থেকে অবস্থার পরিবর্তন করাতে পারেননি তাঁরা পরবর্তীকালে আশ্রয় নেন বাংলাদেশের মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত নালিতাবাড়ি ও হালুয়াঘাট থানার বিভিন্নগ্রামে।[১৩] এরপর ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্থান থেকে উদবাস্তু হয়ে এসে আশ্রয় নেন অসমের বিভিন্ন জেলার ১৭টি গ্রামে। গ্রামগুলি হল: নওগাঁও (বর্তমান হোজাই) জেলার ডেরাপাথার-১, ডেরাপাথার-২, ডেরাপাথার-৩, ডেরাপাথার-৪, Dambour, লক্ষ্মীপাথার, বরপাথার, আমপুখুরি। গোয়ালপাড়া জেলার মাতিয়া(Matia), রোহিনীঝাড় (Rohinijhar), সিদাবাড়ি গ্রাম (Sidabari), দুবাপাড়া গ্রাম (Dubapara Village)। দরং জেলার Ghiladhari Village, Paharipota Village। কার্বিআলং জেলার Lalmati-Kuldong Village। বঙাইগাঁও জেলার Bishnupur Village। N. C. Hills জেলার Doinag Village প্রভৃতি।

ডালুদের গোত্র: ডালুরা মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃতান্ত্রিক গোত্র বা বংশধরকে তাঁরা ডাফা বলে থাকেন। তাঁদের মধ্যে একুশ প্রকার গোত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। গুত্রগুলি হল: মাসি, পীরা, নেংমা, লুরু, কাড়া, গান্ধি, সিচং, মাইবাড়া, কন্না, চুনদি, দিকলপ, ডরাং, হাইজাং, নেংমাই, নেংতঙ, পারা, পাতাং, খাইচপ ইত্যাদি।[১৪]

ডালুদের পদবি: ডালুরা; ডালু পদবি ছাড়া, আরও নানাপ্রকার পদবি ব্যবহার করে থাকেন। যেমন; সিংহ, সরকার, ভুঁইঞা, তালুকদার, রয় ও বর্মন প্রভৃতি।[১৫]

ডালুদের শিক্ষা: ডালুদের মধ্যে শিক্ষার হার খুবই কম। ১৯৭৫ সন পর্যন্ত ডালু কিল্লাপাড়ায় ডালুদের মধ্যে কেবলমাত্র দুজন শিক্ষিত ব্যক্তির পরিচয় মেলে; প্রথম জন হলেন প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার (ডালু জাতির ইতিহাস রচয়িতা), অপরজন হলেন তাঁর মামা (মোমাইদেউ) চারুচন্দ্র সরকার। এছাড়া, এরপর ১৯৯৩ সালে দুজন স্নাতক উত্তীর্ণের পরিচয় মেলে। তাঁরা হলেন ডালু কিল্লাপাড়া গ্রামের শ্রীপ্রেমেন্দ্র চন্দ্র সরকার ও ডালু চৈপানী গ্রামের শ্রীতুষার কান্তি ডালু।[১৬]

ডালুদের ভাষা: সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'আমার বাংলা' গ্রন্থের 'গারো পাহাড়ের নীচে' গল্পটিতে ডালুদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়েছে ডালুরা হাজং, গারো ও কোচদের মতো চাষবাস করে। মুখেচোখে পাহাড়ির ছাপ। হাজংদের মতো ডালুরা বাংলা বলেন। তবে তাঁরা 'ত'-কে 'ট' এবং 'ট'-কে 'ত' আবার 'ড'-

কে দ' এবং 'দ'-কে 'ড' উচ্চারণ করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ডালুদের প্রধান ভাষা মণিপুরি হলেও, আজ তা লুপ্ত হবার পথে। কেননা, তাঁদের ভাষার ওপর প্রভাব পড়েছে বাংলা ও অসমিয়া ভাষার। প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের ভাষায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের সঙ্গে মান্যচলিত বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের রূপটি তুলে ধরা হল:

ডালু কথিত শব্দ	**মান্য চলিত বাংলা শব্দ**
তুই	তুমি
তগরেহ	তোমাদের
আংরেহ	আমার
মাসাং	মাংস
হাঙস	হাঁস
ছোরৈ	মুরগি
ছেরাছেরি	ছেলেমেয়ে
রাইত	রাত
টেম্পাটেম্পি	ছেলেমেয়ে
বাপ	বাবা
মাইয়া	মা
হাই	স্বামী [১৭]

ডালুদের লোকসংস্কৃতি: লোকসংস্কৃতিকে গঠন অনুয়ায়ী দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি (Material Folklore) ও অবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি (Non-material folklore)। এছাড়া, সামগ্রিকভাবে লোকসংস্কৃতিকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন; বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি (লোককাহিনি, লোকগীতিকা, লোকগণিত, লোকবক্তৃতা, লোকনাম, লোকগাথা, প্রবচন, হেঁয়ালি, লোক-শব্দালংকার প্রভৃতি), অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি (লোকনৃত্য, লোকভঙ্গি, লোকসার্কাস প্রভৃতি), আচারব্যবহারগত লোকসংস্কৃতি (লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকউৎসব, লোকচিকিৎসা, লোকমেলা, লোকপুজো প্রভৃতি), খেলাধূলাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি (হাডুডু, কানামাছি, ডাংগুলি প্রভৃতি), বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি (ঘরবাড়ি, লাঙল, মই, দেশীয় বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি), লিখনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি (নক্‌শিকাঁথা, পটচিত্র, আলপনা প্রভৃতি)।[১৮] উল্লিখিত শাখাগুলির মধ্যে অধিকাংশ উপকরণের-ই পরিচয় মেলে ডালুদের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে তা ক্রমান্বয়ে আলোচনা করতে পারি, এভাবে-

ছড়া: বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি শাখাগুলির মধ্যে অন্যতম হল ছড়া। ছড়াগুলি মূলত সৃষ্টি হয়েছিল শিশুদের ঘুমপাড়াবার ও আনন্দবিনোদনের জন্যে প্রাপ্তবয়স্কনারীদের দ্বারা। ডালুদের মধ্যেও ছড়ার পরিচয় পাওয়া যায়; বিশেষ করে, ঘুমপাড়ানি ছড়া। ঘুমপাড়ানি ছড়াকে তাঁরা 'ধাঈ' নাম অভিহিত করে থাকেন। শিশুকে ঘুম পাড়াবারর জন্যে তাঁরা গেয়ে থাকেন--

১। বাবু ঘুমালৌ, পারা জুতালৌ
বরগি আইলো দেশে
বুল বুলাতে ধান খাই আছে
খাজনা দিব কিছে।

২। কিছের মাহী কিছের পেচি
কিছের বিন্দাবন
মরা গাছে ফুল ফুলিছে
মা বর'র ধন।[১৯]

ধাঁধা: ডালুরা ধাঁধাকে থাচ্‌কি, সাঁথর ও দিষ্টান বলে অভিহিত করে থাকেন। ডালু সমাজের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিপরীক্ষার জন্যে গাছতলায় বা ঘরের ভেতরে ধাঁধা ব্যবহার করেন। তাঁদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি ধাঁধা হল এরকম--

১। এক চারাং চুপারী,
গোনতে নাপায় বেপারী।
উত্তর: তরা।

২। কাঠের গায় মাংসের দিন,
সেবেটা চলচে গাদলার দিন।
উত্তর: শামুক।

৩। গলা আইচে,
তালা নাই।
উত্তর: মাছধরার পল।

৪। থালি থালি ঝান ঝান
থালি নিলো চোরে,
এই পর্বতে লাগিছে আগুন
কাই নিবাইতে পারে।
উত্তর: সূর্য।[২০]

লোকসংগীত: পৃথিবীর প্রতিটি জনজাতি বা ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে নানানপ্রকার গীত। ডালুরাও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। তাঁদের মধ্যে বিভিন্নপ্রকার পূজাপার্বণ ও আচার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্রকরে বিয়ানাম (বিয়ের গীত), বারমাসি গীত, বন্দনা গীত, ত্রিনাথের গীত ইত্যাদি প্রচলন রয়েছে। কার্তিক মাসের শেষদিন ডালুরা কার্তিক পূজা করে থাকেন। কার্তিক পূজা উপলক্ষে তাঁরা গেয়ে থাকেন বন্দনা গীত, এভাবে-

পূর্বতে বন্দনা করি পূর্ব বানচর
সেই খানেতে উদয় হৈ'ল দেবা-দেবী কর
উত্তরে বন্দনা করি কৈলাশ পর্বত,
সেই খানেতে বিরাজ ভোলা মহেশ্বর।
পশ্চিমে বন্দনা করি কিন্নদি সাগর।।
সেই খানেতে বাইলে দিঙগা চান্দ সদাগর,
আকাশে বন্দনা করি আকাশে কামিনী,
পাতালে বন্দনা করি পাতালর বাচুকী,
তার পরে বন্দনা করি সবারে চরণ,

সবর শেষে বন্দনা করি যত দেবগণ।। [২১]

বিয়ের গীত: ডালুদের মধ্যে বিয়ে প্রচলিত রয়েছে। আর সেই বিয়েকে কেন্দ্রকরে তাঁরা গেয়ে থাকেন নানানপ্রকার গীত। জল তোলাকে কেন্দ্রকরে তাঁরা গেয়ে থাকেন পানীতোলা গীত। যেমন-

পন্ত চারিয়া দে নীল মণি কালা (কৃষ্ণ)
আজিকে পাই আসি লাগল
না দিব চারিয়া,
আরু এক দিনা যাওরে মামি
আমাকে ভারায়া,
শুন শুন অ-গ-মামী আমার বচন
মুটিয়া ভিজাব মামি তোমার বসন।।

আবার পাশা খেলাকে কেন্দ্রকরে তাঁরা গেয়ে থাকেন:

পাশা খেলাই রে,
একবার খেলাই পাশা হারিয়াচে যাই
দুইবার খেলাই পাশা হারিয়াচে যাই
তিনবার খেলাই পাশা হারিয়াচে যাই
চারিবার খেলাই পাশা হারিয়াচে যাই
চারিবার খেলাই পাশা হারিয়াচে যাই
পাঁচবার খেলাই পাশা হারিয়াচে যাই
ছয়বার খেলাই পাশা হারিয়াচে যাই
সাতবার খেলাই পাশা হারিয়াচে যাই

কৈ গিলিরে আই গোলা তুলি আসি নে রে,
যত আছে আই গোলা ঘরতে চান্দাই।।

বারমাসি গীত:

মাঘতে মাধব করে মথুরা গমন,
দহ দিশে শূন্য হেরি নব বিন্দাবন।।
ফাল্গুনাদি গুণ-দোষ সিতা উঠে রোল,
গকুলে গোবিন্দ নাই কে করিবে দোল।।
চৈ'ত্রতে চাতক পক্ষী নিকুঞ্জ কুঠিরে,
প্রিয় প্রিয় র'ব কর ডাকে উচ্চ সুরে।।
বৈশাগে বিদেশ গৈছে প্রিয় গুণ মন্থ,
শ্রেয় বডি শ্রীরাধিকা দোষ নাই অন্ত ।।
জেষ্ঠতে যমুনা জল খেলিতে বনমালী
শ্যাম অঙ্গে দিতাম জল অঞ্জলি অঞ্জলি,
আহার নবীন মেঝে ভ্রমরে গুজে।।

তা দেখিয়ে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ মনত পরে,
শাওণে সকলে মোরা লৈ প্রিয় সুখি।।
নিকুঞ্জে বসিয়া হার গাঁঠিতাম মালতি,
ভাদ্রমাহে ভরা গাঞ দুকোল পাথার।।
কেমনে হৈ পার নাজানি সাঁতার,
আহিনে অম্বিকা পূজা করে জগত জনে।।
অবশ্যে আহিব প্রিয় অষ্টমীর খনে,
কার্তিকে করিলা হরি কালিয়াদমনে।।
নানান জাতি পুষ্প ফুটে অঙ্গিরি ভোচন,
অঘন মাহে শুনিচি মোরা অপরূপ কথা।।
অক্রবে ধরিছে চিরি নবদত্ত ছাতা,
পোহ মাহতে পত্র লেখে দিলাম সখি হাতে।।
কে যাইবে মথুরা লোক নাই তার সাথে।।
শ্রীরাধিকার বারমাহী সমাপন হ'ল,
ভক্তগণ প্রেমানন্দে হরি হরি বোল।।[২২]

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার: জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ে ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্রকরে ডালুদের মধ্যে নানাপ্রকার বিশ্বাস ও সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে, 'মহিমার্ণব শ্রীযুক্ত ডালুবর্গের চৌদ্দ আনীর সালিশীর' অন্তর্গত 'ধর্ম্মের নিয়মাবলী' অংশে ডালুদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের দিকটি তুলে ধরা হল-

১। শ্রীশ্রীগুরুদেবকে একমাত্র দেবতারূপে মেনে চলবে।
২। শুভকাজ সম্পন্ন করতে হবে স্বজাতির অধিকারী বৈষ্ণবদের দ্বারা।
৩। যে কোন দেবতা অর্চনার আগে ঈশ্বর শ্রীগুরু পূজা করতে হবে।
৪। স্ত্রীলোকের গর্ভ হলে পঞ্চমৃত সাধভক্ষণ শাস্ত্র মতে করতে হয়।
৫। শিশু ভূমিষ্ট হবার দশদিনের পর জাতক্রিয়ার দ্বারা শুদ্ধ করতে হবে।
৬। এরপর তিন মাস পরে শিশুর নামকরণ করা হবে।
৭। এগারো মাস পরে চূড়াকরণ হবে শিশুর।
৮। পিতামাতার অভ্যন্তরে প্রথম দিন দানকর্ম ও উপবাস, দ্বিতীয় দিন ফলমূল ভক্ষণ, তৃতীয় দিন সজাতি নিয়ে শ্রাদ্ধ, পিণ্ডি দান ও হবিষ্য করতে হবে। এরপর দশদিনে ক্রিয়াশৌচ, এগারো দিনে শ্রাদ্ধ করতে হবে। সঙ্গে পিতৃ ও মাতৃপক্ষের লোকেরা তিন দিনে মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করবে।
৯। গাই গোরুর দ্বারা হাল কর্ষণ করা যাবে না। এর অমান্য করলে দণ্ড স্বরূপ প্রায়শ্চিত ও পঁচিশ টাকা দিতে হবে।
১০। স্ত্রীলোক হাটেবাজারে যেতে পারবে না।
১১। বিধবার পুনরায় বিবাহ হলে শাখা, সিঁদুর ও পাইর বস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না।
১২। গোস্বামী, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, গোয়াল ও কায়েত এঁদের ছাড়া অপর কোন কোমজাতির কাছ থেকে জল গ্রহণ করবে না।
১৩। ঘর জামাই এলে দুবছর অপেক্ষা করে বিয়ে দেবে। বিয়ে হবার পর স্ত্রীকে নিয়ে যেখানে খুশি

সেখানে যেতে পারবে।

১৪। সামাজিক কোন ঘটনা ঘটলে সমাজের মাতব্বেরা সমাধান করবে।

১৫। মৃতদেহের সৎকার তেরো দিনে করতে হয়।

১৬। অমঙ্গল দূর করার জন্য ইষ্টদেবতাকে হাঁস, পায়রা, ছাগল বলি দিয়ে বিভিন্ন উপচারের সঙ্গে নৈবেদ্য দেওয়া হয়।[২৩]

ডালুদের পূজাপার্বণ: বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত নানাপ্রকার উৎসবানুষ্ঠানের সঙ্গে সাদৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যায় ডালুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত পূজাপার্বণগুলির। ডালুদের মধ্যে অনুষ্ঠিত পূজাপার্বণগুলি হল; হাতিযাত্রা পূজা, হরদৈব পূজা, কেরেংবুড়ি বা হরলাবুড়ি পূজা, ত্রিনাথ পূজা, দোলযাত্রা, বাসন্তীপূজা, চৈত্রসংক্রান্তি, মনসাপূজা, বাস্তুপূজা, মা কামাখ্যার পূজা, মাইচরী পূজা, হাইলাবুড়ি পূজা, মলয়বুড়ি পূজা, পথে-খাউরি পূজা, কাণিদেউ পূজা, বনদেউ পূজা প্রভৃতি। এছাড়া আর্য মূলীয় উৎসব সরস্বতীপূজা, দোলযাত্রা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, বিশ্বকর্মপূজা ও দুর্গাপূজা ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে ডালুদের মধ্যে। উল্লিখিত পূজাপার্বণগুলি থেকে কয়েকটি পূজার বিস্তৃত পরিচয় জেনে নেওয়া যেতে পারে-

হাতিযাত্রা পূজা: ডালুদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সুপ্রাচীন পূজাপার্বণগুলির মধ্যে অন্যতম হল হাতিযাত্রা পূজা। সম্প্রতি এ পূজা আর ডালুদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় না। ডালুরা এ পূজা করতেন হিংস্র জীবজন্তু তথা বাঘ-বানর বিশেষ করে হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। পূজাটি আয়োজন করা হত বড় আকারের তেঁতুল গাছের গোড়ায়। তেঁতুল গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে বানানো বাঘ, বানর ও হাতিসহ অন্যান্য জীবজন্তুর মূর্তি সাজিয়ে পূজা করা হত।[২৪]

হরদৈব পূজা: মহাদেব বা বৈদ্যনাথ পূজাকে ডালুরা হরদৈব পূজা বলে অভিহিত করে থাকেন। পূজার মূল উদ্দেশ্য আপদ-বিপদ থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখা। ডালুরা এ পূজায় চাল-চিনি-দুধ-কলা প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহার করেন। [২৫]

কেরেংবুড়ি বা হরলাবুড়ি পূজা: ডালুরা কেরেংবুড়ি বা হরলা বুড়ির পূজা শেওড়া গাছের গোড়ায় অনুষ্ঠিত করেন। ডালু সমাজের নিসন্তান বিবাহিত নারীরা সন্তান কামনায় ও বিকলাঙ্গ শিশুদের সুস্থ হবার জন্যে এ পূজা করেন। পূজায় কেরেংবুড়ি তথা হরলা দেবীর উদ্দেশ্যে দুধ-কলা উৎসর্গ করা হয়।[২৬]

ত্রিনাথ পূজা: বাংলার লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্রকরে অনুষ্ঠিত পূজাপার্বণগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ত্রিনাথ পূজা। ত্রিনাথ পূজা উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনজাতি ও ভাষাভাষীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। যেমন; বাঙালি হিন্দু, রাজবংশী, হাজং ও ডালু প্রভৃতি। ডালুদের কাছে ত্রিনাথ পূজা ত্রেনাথের পূজা বা কল্কি সভা নামে অধিক পরিচিত। ডালু সমাজের পুরুষেরা সোমবার ও মঙ্গলবার মূলত কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে এ পূজা করে থাকেন। পূজায় তাঁরা ব্যবহার করেন তিনটি, আবার কখনও কখনও একান্নটি কল্কি। এছাড়া তিনটে তাম্বুল, তিনটে পান ও একপয়সার তেল। তবে ত্রিনাথ পূজার মূল উপকরণ গাঁজা। গাঁজা দিয়ে পূজায় ব্যবহৃত কল্কিগুলি সাজানো হয়। ভক্তেরা মানত অনুয়ায়ী পূজায় কল্কি ব্যবহার করেন। যদি কোন ভক্ত মানত করেন সন্তান ভালো হয়ে উঠলে ৫১টি কল্কি দেবেন তাহলে ত্রিনাথকে ৫১টি কল্কি দিতে হয়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে ভক্তের ক্ষতি হতে পারে বলে ডালুরা বিশ্বাস করেন। পূজার উদ্দেশ্য বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে নিজেদের ও গাইগোরুকে মুক্ত রাখা। ত্রিনাথ পূজা উপলক্ষে তাঁরা স্মৃতিতে সংরক্ষিত করে

রাখা লোকগান ও লোককাহিনি পরিবেশন করেন। এ প্রসঙ্গে দীপেন ডালুর কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি গান ও একটি লোককাহিনি নিম্নে তুলে ধরছি-

ঠাকুর তিননাথ সাজাইয়া,
সাজাও বনফুলে, অসজনী গো।
অষ্টগাছের অষ্টফুল আনগো তুলিয়া
ঠাকুর তিননাথের আসনে ফুল দেউগো সাজাইয়া,
সজনী গো।
গাঁজা আনো ঝটা ঝটা কুলকিতে সাজইয়া।
ঠাকুর তিননাথের আসনে
কুলকি দেউগো সাজাইয়া।[২৭]

ত্রিনাথ পূজার সাথে সংশ্লিষ্ট লোককাহিনি: ভারতের উরিষ্যার একটি গ্রামে দুখী নামে একজন বালক বাস করত। তার একমাত্র সম্বল ছিল সুন্দর একটি গাইগোরু। গোরুটি হঠাৎ করে মারা গেলে রাখাল বালক মনের দুঃখে বটগাছের গোড়ায় বসে কাঁদতে থাকে। সেই সময় বটগাছে থেকে তিনটি কণ্ঠস্বর একসঙ্গে বলে ওঠেন, "রাখাল তুই কাঁদিস না; তুই বাজারে যা মাত্র তিন পয়সা খরচ কর, তিন পয়সার মধ্য থেকে এক পয়সার গাঁজা, এক পয়সার দুধ, এর এক পয়সার আতপচাল ও কলা কিনে এই বটগাছ তলায় এসে আমাদের নামে পূজা দে; তোর গাই ভালো হয়ে যাবে।" তাদের কথামত রাখাল পূজা করলে সঙ্গে সঙ্গে গাইগোরু জীবিত হয়ে ওঠে।[২৮]

ডালুদের খাদ্য: ডালুদের প্রধান খাদ্য ভাত। এছাড়া তাঁদের প্রিয় খাবার কোটা সিদোল, লেবা, খার, শুয়োর, হাঁস ও মুরগির মাংস।[৩৬] চারুচন্দ্র সান্যাল সিদোল সম্পর্কে বলেছেন : "রোদে শুকনো মাস (শুকা)কে কাঠের উদুখলে (ছাম) গুঁড়ো করা হয়। উদুখল বা ছামের মধ্যে এবার রাখা হয় কালা কচু বা মানকচু, কাঠের দণ্ড বা গাইন দিয়ে এই কচুকে ভালভাবে মেশানো হয় মাছের সঙ্গে। কয়েক কয়া রসুনো মেশানো হয়, ... মিশ্রণটি এরপর 'ছাম' থেকে বের করে 'ছেকা' জল মিশিয়ে একটা গাঢ় লেই তৈরি করা হয়। এদিয়ে বল তৈরি করে রোদে শিকিয়ে মাটির বয়মে রেখে দেওয়া হয়। খাবার আগে কয়েকটা বল অল্প আগুনে ঝলসে আচারের মতো খাবারের সঙ্গে খাওয়া হয়। সম্ভবত মাছের আঁশটে গন্ধ দূর করার জন্য এর সঙ্গে পেঁইয়াজ-রসুন মেশানো হয়। ..."[২৯] ক্ষেত্রসমীক্ষায় গিয়ে ডালু সমাজের প্রবীণ তথ্যদাতাদের কাছে জানা যায়, উক্ত পদ্ধতিটে তাঁরাও সিদোল প্রস্তুত করে রাখেন।

এছাড়া, ডালুরা ফলের মধ্যে তেঁতুল, কুল, লেবু, জাম, লিচু, কমলা ও আনারস এবং তিতা জাতীয় খাবারের মধ্যে নিম, চিরতা ও হরতকি খেয়ে থাকেন। তবে, তাঁরা গোরু ও মহিষের মাংস খান না।

লোকপোশাক: পোশাকাশাকের ক্ষেত্রে দেখা যায় ডালুদের পুরুষ ও নারীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পোশাক রয়েছে। পুরুষদের পোশাক গামছা, ধুতি-জামা ও মহিলাদের পাশাক হল পাথানি। পাথানির দৈর্ঘ্য ৬৩ ইঞ্চি, প্রস্থ ৪৫ ইঞ্চি।[৩০]

লোকবাদ্যযন্ত্র: নানাপ্রকার লোকবাদ্যযন্ত্রের পরিচয় মেলে ডালুদের মধ্যে। যেমন: ঢাকের মধ্যে মা ঢাকি, চাউ ঢাকি, থান ঢাকি, বাঁশির মধ্যে দুরকমের চুক ও ডুক বাঁশি। এছাড়া খোল, করতাল ও দোতরা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র চোরাজ প্রভৃতি।[৩১]

ডালু সম্পর্কিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও বক্তৃতা: ডালুদের নিয়ে প্রথম বই প্রকাশিত হয় পণ্ডিত মুখ্যদা চরণ (Pandit Mokhyada Charan Samadhyaya)-এর লেখা 'ডালু জাতির বিবরণ' (Dalu Jatir Bibaran)। প্রকাশ কাল জানা যায় না। দ্বিতীয় বই বাংলায় লেখেন প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার (Prafulla Chandra Sarkar) 'ডালু জাতির ইতিহাস' (Dalu Jatir Itihas)। প্রকাশ কাল ১৯৯৩। প্রবন্ধ বের হয় কে সি সিং সম্পাদিত 'People : Magalaya' গ্রন্থে শিবানী রয়ের (Shibani Roy) 'ডালু' নামে। প্রকাশকাল ১৯৯৪। এছাড়া প্রবন্ধের পরিচয় মেলে খগেন্দ্র হাজং-এর 'ডালু জাতির পরিচয়', একতা পত্রিকায়, সাপ্তাহিক, বর্ষ ৫২, সংখ্যা ৩০, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, রবিবার। অসমিয়াতে শ্রীমতি দেবযানী কোচ দুটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রথমটি হল, গারো পাহার জিলার ডালুলোক সকল-এটি চমু অবলোকন। দ্বিতীয়টি হল, ডালু সমাজের বস্তু সংস্কৃতি। ইংরেজিতেও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, Dalus of Meghalaya Tribes of India (https://archives.prasarbharati.org) নামে। Dr. Ebrahim Ali Mondal লেখেন, Socio-Economic And Cultural Life Of Dalu's Of Garo HillS নামে। প্রকাশ পায় মেঘালয় থেকে Research NEBULA-তে (Vol. IV, January 2016)। বক্তৃতার পরিচয় মেলে আবদুর রশীদ স্মারক বক্তৃতামালা৮-অধ্যাপক দীপক কুমার রায়-মেঘালয় ও অসমের ডালু সংস্কৃতি ১০ জুলাই ২০২১, youtube https://www.youtube.com/watch?v=6CXn_9X12U8। এছড়া, ইউটিউব-এ ডালুদের নিয়ে তথ্য পাওয়া যায় এ লিঙ্কে-https://www.youtube.com/watch?v=olaa5UBccXg।

আলোকচিত্র :

শীতলা পূজা, ২নং ডেরাপথার ডালুগাঁও, হোজাই, অসম

বাস্তু পূজা, ২নং ডেরাপথার ডালুগাঁও, হোজাই, অসম

থ’ব মাগা, ২নং ডেরাপথার ডালুগাঁও, হোজাই, অসম

ডালু জনগোষ্ঠীর লোকনৃত্য, ২নং ডেরাপথার ডালুগাঁও, হোজাই, অসম

পাতানি তৈরির মুহূর্ত, ২নং ডেরাপথার ডালুগাঁও, হোজাই, অসম

বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি, ২নং ডেরাপথার ডালুগাঁও, হোজাই, অসম

পুরুষদের লোকনৃত্য, ২নং ডেরাপথার ডালুগাঁও, হোজাই, অসম

তথ্যসূত্র:

1) অভিজিৎ রায়, এরশাদ আলী, সুকান্ত সেন : বাংলাদেশের ডালু, বারসিক, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ৬-৭।
2) A report on the Dalus of Assam for their inclusion in the list of scheduled tribe (p) in Assam.
3) তদেব।
4) Dr. Ebrahim Ali Mondal: Socio-Econimic and Culturul Life of Dalu's of Garo Hills. Research Nebula, Vol. Issue IV, January 2016, Meghalaya, p. 64.

5) http://14.139.206.50:8080/jspui/bitstream/1/2992/1/ETHINICITY%20VS.pdf T.B. Subba: Ethnicity vs Development: The Dalus in the West Garo Hills District of Meghalaya, p. 366.
6) খগেন্দ্র হাজং: একতা পত্রিকা, সাপ্তাহিক, বর্ষ ৫২, সংখ্যা ৩০, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, রবিবার।
7) https://bn.banglapedia.org/index.php/%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81, on 11/08/2023 at 10 A.M.
8) অভিজিৎ রায়, এরশাদ আলী, সুকান্ত সেন : বাংলাদেশের ডালু, বারসিক, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ৮।
9) তদেব, পৃ. ৭।
10) Dr. Ebrahim Ali Mondal: Socio-Econimic and Culturul Life of Dalu's of Garo Hills, Research Nebula, Vol. Issue IV, January 2016, Meghalaya, p. 64.
11) অভিজিৎ রায়, এরশাদ আলী, সুকান্ত সেন : বাংলাদেশের ডালু, বারসিক, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ৮।
12) খগেন্দ্র হাজং: একতা পত্রিকা, সাপ্তাহিক, বর্ষ ৫২, সংখ্যা ৩০, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, রবিবার।
13) দেবযানী কোচ: গারো পাহার জিলার ডালুলোক সকল-এটি চমু অবলোকন (ফোটোকপি করে সংগৃহীত, কাজেই বাকি তথ্য অনুল্লেখ রয়ে গেল)।
14) সমেন্দ্র ডালু; পিতা: কামনাথ ডালু, পেশা: কৃষিকাজ, ২নং ডেরাপথার ডালুগাঁও, হোজাই, অসম, তারিখ: ২৩/১০/২০২১, সময় - দুপুর ১টা।
15) তথ্যদাতা; ঝাপান ডালু, পিতা: পাণ্ডব ডালু, ডেরাপাথার, হোজাই, অসম, তারিখ: ২০/১১/২০২১, সময়- সকাল ১১টা।
16) তথ্যদাতা; হিমাংশু ডালু, পিতা: হরিচরণ ডালু, ২নং ডেরাপথার ডালুগাঁও, হোজাই, অসম, তারিখ: ২০/১১/২০২১, সময় - দুপুর ১২টা।
17) তথ্যদাতা; শঙ্কর ডালু, পেশা: শিক্ষক, ডালুপাড়া, ফুলমারি, তারিখ : ২০/১১/২০২১, সময় - বিকেল ৪টা।
18) ডক্টর মযহারুল ইসলাম: ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, অবসর, ঢাকা, প্রথম অবসর প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২, পৃ. ১৫।
19) তথ্যদাতা; শঙ্কর ডালু, পেশা: শিক্ষক, ডালুপাড়া, ফুলমারি, তারিখ: ১২/০৭/২০২২, সময় - সকাল ১১টা।
20) তথ্যদাতা; হিমাংশু ডালু, পিতা: হরিচরণ ডালু, ২নং ডেরাপথার ডালুগাঁও, হোজাই, অসম, তারিখ: ১৩/০৭/২০২২, সময় - সকাল ১১টা।
21) তথ্যদাতা; শঙ্কর ডালু, পেশা : শিক্ষক, ডালুপাড়া, ফুলমারি, তারিখ : ২৩/১০/২০২১, সময় - সকাল ১১টা।
22) তথ্যদাতা; হিমাংশু ডালু, পিতা: হরিচরণ ডালু, ২নং ডেরাপথার ডালুগাঁও, হোজাই, অসম, তারিখ: ২৫/১০/২০২১, সময় - সকাল ১০টা।
23) তথ্যদাতা, ঝাপান ডালু, পিতা: পাণ্ডব ডালু, ডেরাপাথার, হোজাই, অসম, তারিখ: ২৪/১০/২০২১, সময়- বিকেল ৪টা।

24) অভিজিৎ রায়, এরশাদ আলী, সুকান্ত সেন : বাংলাদেশের ডালু, বারসিক, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ৮।
25) তদেব, ৩৭।
26) তদেব, ৩৬।
27) তথ্যদাতা; ঝাপান ডালু, পিতা: পাণ্ডব ডালু, ডেরাপাথার, হোজাই, অসম, তারিখ: ২৪/১০/২০২১, সময় -বিকেল ৩টা।
28) অভিজিৎ রায়, এরশাদ আলী, সুকান্ত সেন: বাংলাদেশের ডালু, বারসিক, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৯,পৃ. ৩৬-৩৭।
29) তৃপ্তি সান্ত্রা (অনুবাদ) : চারুচন্দ্র সান্যাল- উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ডেসেম্বর ২০১৭, পৃ. ৯৯।
30) তথ্যদাতা; হিমাংশু ডালু, পিতা: হরিচরণ ডালু, ২নং ডেরাপথার ডালুগাঁও, হোজাই, অসম, তারিখ : ২৪/১০/২০২১, সময় - দুপুর ১২টা।
31) তথ্যদাতা; শিবেন ডালু, পিতা: হরিচরণ ডালু, ২নং ডেরাপথার ডালুগাঁও, হোজাই, অসম, তারিখ : ২৪/১০/২০২১, সময় - সকাল ১১টা।

গ্রন্থপঞ্জি:

1) ইসলাম ডক্টর মযহারুল: 'ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন', অবসর, ঢাকা, প্রথম অবসর প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২।
2) ইসলাম শেখ মকবুল: 'লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা, ২০১১।
3) চট্টোপাধ্যায় তুষার: 'লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান', এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লয়, চতুর্থ সংস্করণ মার্চ ২০০৪।
4) চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার: 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ', রূপা পাব্লিকেশন, নতুন দিল্লী, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৫।
5) চট্টোপাধ্যায় সৌগত (সম্পা.): 'বাংলার ছড়া ছড়ার বাংলা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৬।
6) বিশ্বাস অচিন্ত্য বিশ্বাস: 'লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞান', নিউ বইপত্র, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২১।
7) মজুমদার মানস: 'লোকসাহিত্য-পাঠ', দে'জ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৯।
8) রায় অভিজিৎ, আলী এরশাদ, সেন সুকান্ত: 'বাংলাদেশের ডালু', বারসিক, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৯।
9) সান্ত্রা তৃপ্তি (অনুবাদ): 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী', আনন্দ, কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ডেসেম্বর ২০১৭।